যুগান্তর

তারিখ 11 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দুর্বিষহ সেশনজটের কবলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানীতে অবস্থিত দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, যা বিভিন্ন কারণেই সংবাদের শিরোনামে পরিণত হয়, তবে যতটা না এর সাফল্যের কারণে তার চেয়ে ঢের বেশি এখানকার অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ, অবরোধ এবং সেশনজটের কারণে। তথাপি দেশের এক প্রান্তে গ্রাম্য পরিবেশে অবস্থিত বিধায় এখানকার অনেক কথা অপ্রকাশিত থেকে যায়। তাই যারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে তাদের দুঃখ-দুর্দশা আর দীর্ঘশ্বাসগুলো এসব পাহাড়-পর্বতের মধ্যেই চাপা পড়ে যায়। অনেক আশা আর স্বপ্ন নিয়ে প্রতি বছর অনেক ছাত্রছাত্রী এখানে ভর্তি হয় অথচ নতুনত্বের স্বাদ মলিন হতে না হতেই মনটা ভরে ওঠে অফুরন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতায়। এই

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন

বিশ্ববিদ্যালয়ের মারাত্মক সমস্যাগুলোর একটি হচ্ছে দুর্বিষহ সেশনজট। বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রেক্ষিতে এটা হয়তো নতুন কোন বিষয় নয়। কিন্তু কয়েকটা বিভাগে সেশনজট এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তা অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। সেই ধরনের কয়েকটি বিভাগের মধ্যে ইংরেজি বিভাগ সবার চেয়ে এগিয়ে। শুধু যে সেশনজট তাই-না, সামগ্রিক অব্যবস্থাপনার দিক থেকেও এই বিভাগটি সবার সেরা। আজ প্রায় এক হাজার ছাত্রছাত্রী এই দুর্ভোগের কবলে পড়ে অসহনীয় সেশনজটে ভুগছে। এই বিভাগের প্রতিটি বর্ষে রয়েছে দুই থেকে তিনটি করে ব্যাচ। এখানে ৩ বছরের অনার্স কোর্সে ভর্তি হলেও প্রথম বর্ষেই লেগে যায় প্রায় ৩ বছর। প্রত্যেক বর্ষে গড়ে ২.৫ বছর করে অনার্স শেষ করতে প্রায় ৮ বছর লেগে যায়। ব্যাপারটা অনেকের কাছে কাল্পনিক মনে হলেও এটাই নির্মম সত্য। শুধু একটা বর্ষের উদাহরণ দিলেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ২০০০-২০০১ সেশনে যারা এই বিভাগে ভর্তি হয় তাদের প্রথম বর্ষেই অতিবাহিত করতে হচ্ছে ৩৪ মাস। তাদের পর ২০০১-২০০২ এবং ২০০২-২০০৩ সেশনে আরও দুটি ব্যাচ ভর্তি হয়েছে। অথচ এখনও ২০০০-২০০১ সেশনের প্রথম বর্ষের পরীক্ষা তো দূরে থাক, পরীক্ষার তারিখই নির্ধারিত হয়নি। ফলে প্রতি বর্ষের মতো এই বর্ষের ছাত্রদেরও অতল হতাশায় হাবুডুবু খেয়ে দুর্বিষহ জীবন কাটাতে হচ্ছে। আর এজন্য দায়ী শিক্ষকের অনৈতিকতা, কর্তব্যে অবহেলা, রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, স্বেচ্ছাচারী মনোভাব এবং অসহযোগিতার মানসিকতা। এই বিভাগের ছাত্রদের শিক্ষকদের আন্তরিকতার বদলে শিক্ষকদের নির্মম শিকারে পরিণত হতে হয়। তাদের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিষ্ঠিত করতে তারা সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকেন তাদের নিজস্ব কোচিং সেন্টার, বেসরকারি ইউনিভার্সিটি কিংবা নিজস্ব সুনাম এবং আর্থিক লাভের পেছনে। এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের বাসায় টাকার বিনিময়ে পড়ানোটা আজকাল ওপেন সিক্রেট। তিন বছরে পরীক্ষা না নিলেও তারা কিন্তু ক্লাসে সিলেবাসের শতকরা ৫০ ভাগও শেষ করান না। তাছাড়া এক পরীক্ষার খাতা দেখতে তাদের এক বছর লেগে যায়। ফলে প্রত্যেক বর্ষেই পরীক্ষার রেজাল্ট পাওয়ার জন্য কমপক্ষে ১২ মাস অপেক্ষা করতে হয়। তারা নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স অনুসারী দাবি করলেও ১০০ দিনেও (যেখানে অর্ডিন্যান্সে ২০ দিনে রেজাল্ট দেয়ার কথা রয়েছে) সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশ করেন না। আমাদের দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা ভর্তি হয় তাদের অধিকাংশই আসে মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্ন মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি থেকে। এখন এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা আর তাদের মা-বাবার সামনে দাঁড়াতে পারে না। তারা যখন আমাদের দিকে কাতর দৃষ্টি নিয়ে তাকান তখন চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে হে ধরণী দ্বিখণ্ডিত হও! আমাদের পরিবার আর আমাদের জিজ্ঞাসা করে না– পরীক্ষা আদৌ হবে নাকি! তারাও হয়তো তাদের প্রিয় সন্তানটিকে নিয়ে আর কোন স্বপ্ন দেখে না। এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের যেমন বন্ধু-বান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয় তেমনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়তে হয়। মুখের রেখাগুলো দিন দিন মলিনতর হয়ে ওঠে। আজ আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর, কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে আমাদের সম্মানিত শিক্ষকদের কাছে আবেদন করব আমাদের আপনারা বাঁচান। আমাদের স্বপ্নগুলোকে দুমড়েমুচড়ে নষ্ট করে ফেলবেন না।

জামান, আফতাব, নীলা, মিতু, ইংরেজি বিভাগ, চ.বি.